দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপান্তরকামিতা আর উভকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার জগৎ

রূপান্তরকামিতার[1] একটা উদাহরণ দিয়ে শুরু করি। আই আইটির এক ভদ্রলোকের কথা জানতাম। খুব মেধাবী এক ছাত্র। কিন্তু পুরুষ হয়ে জন্মালে কি হবে, তিনি নিজেকে সবসময় নারী মনে করতেন। নারীদের সাথে থাকতে বা বন্ধুত্ব করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তিনি। ভদ্রলোকের নাম নৃসিংহ মন্ডল। দৈনিক আজকাল ১৯৯৯ সালের ১২ই আগাস্ট তাকে নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিল এই শিরোনামে- "ছয় বছর ধরে মেয়ে হতে চাইছে আই আইটির কৃতি ছাত্র"। সনাতন চিকিৎসা পদ্ধতিতে মনে করা হয়, এধরনের লোকেরা নিশ্চয় মনোরোগী। ভারতের নামকরা ডাক্তারেরা তাকে পরীক্ষা করলেন, তার শরীরে হরমোনগত কোন তারতম্য চোখে পড়ল না, মানসিক বিকারের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না। ডাক্তারেরা কি করবেন ভেবে পেলেন না। শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রে নয়, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তৈরি হল একধরনের অস্বস্তিকর পরিস্থিতির এবং জটিলতার। নৃসিংহ মন্ডলও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি মানবাধিকার কমিশনের মধ্যমে নিজের "নারী হবার অধিকার" অধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মেডিকেল বোর্ডের সামনে দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে বললেন - "ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে হত আমি ছেলে নই, মেয়ে। বাবা রেগে যেত। মা কিছু বলতেন না। ছেলেবেলা থেকেই মেয়েদের পোষাক পরতে পছন্দ করতাম। চিরকালই আমার ছেলেবন্ধুর চেয়ে মেয়ে বন্ধু বেশি। তাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি"। চিকিৎসকেরা তাকে

---

[1] রূপান্তরকামিতার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে ট্রান্সেক্সুয়ালিটি (Transexuality) । ট্রান্সেক্সুয়াল মানুষেরা ছেলে হয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে) জন্মানো সত্ত্বেও মনমানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন (কিংবা কখনো আবার উল্টোটি- নারী হিসেবে জন্মানোর পরও মানসিক জগতে থাকেন পুরুষসুলভ) । এদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোষাক পরিধান করেন, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় (ট্রান্সভেস্টিজম / ক্রসড্রেস), আবার কেউ সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তরিত মানবে (Transexual) পরিণত হন। এরা সকলেই বৃহৎ রূপান্তরপ্রবণ সম্প্রদায়ের (Transgender) অংশ হিসেবে বিবেচিত। বইয়ের শেষে ট্রান্সজেন্ডার, ট্রান্সেক্সুয়ালিটি এবং ট্রান্সভেস্টিজম সংক্রান্ত পরিভাষা দ্রষ্টব্য। বাংলাভাষায় এদেরকে পরিচিত করার সঠিক বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নেই। এ বইয়ের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছে কিছু নতুন পরিভাষা তৈরীতে।

বোঝালেন, "একবার ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে গেলে ভবিষ্যতে কোন পরিস্থিতিতে চাইলেও আবার ছেলে হওয়া যাবে না"। নৃসিংহের পালটা প্রশ্ন মেডিকেল বোর্ডকে - "সে পরিস্থিতি আসবে কেন? আমার যথেষ্ট বুদ্ধি- বিবেচনা আছে। আমি ভেবেচিন্তেই মেয়ে হতে চাই"। তার প্রতি প্রশ্ন ছিল - "সামাজিক অসুবিধা হতে পারে, চাকরী- বাকরীর অসুবিধা হতে পারে"। তার জবাব ছিল - "এখন স্কলারশিপ পাই। গবেষনার পরে দেশে বিদেশে চাকরী পাবই। আর সামাজিক কোন অসুবিধা আমার হবে না। আর হলেও আমার কিছু যায় আসে না"[2]।

আরেকটা উদাহরণ দেই। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জরগেন্সেনের লেখা "Christine Jorgensen: A Personal Autobiography" বইটির কথা বলা যায়। ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের আগের নাম ছিল জর্জ জরগেন্সেন। তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। তার রূপান্তরকামী মানসিকতার জন্য চাকরী চলে যায়। পরে ১৯৫২ সালে অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন। ক্রিস্টিন জরগেন্সেন ছাড়াও আরকজন বিখ্যাত রূপান্তরকামী ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন ডঃ রেনি রিচার্ডস। চক্ষুচিকিৎসক, এক সময় ছিলেন পেশাদার টেনিস খেলোয়াড়। ১৯৭২ সালে পুরুষদের গ্রান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের ফাইনালেও পৌঁছেছিলেন। একসময় বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন একটি সন্তানের পিতা। সে সময় তার নাম ছিলো রিচার্ড রাসকিন্ড। কিন্তু সব সময়ই তিনি নিজেকে নারী ভাবতেন। শেষপর্যন্ত নিজের অভিপ্রায়কে মূল্য দিয়ে সেক্স রিএসাইনমেন্ট অস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে তিনি নারীতে রূপান্তরিত হন এবং রেনি রিচার্ডস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন । তার এই রূপান্তরকরণ টেনিস জগতে জটিলতা সৃষ্টি করে। ইউনাইটেড স্টেটস টেনিস এসোসিয়েশন তাকে নারী হিসেবে ১৯৭২ সালে ইউএস ওপেন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে বাধা দেয়। রেনি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করেন এবং আইনী লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে অবশেষে ১৯৭৭ সালে মহিলা হিসেবে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি তার জীবনের নানা জটিলতার কাহিনী উল্লেখ করে বই লেখেন ' No Way Renee: The Second Half of My Notorious Life (২০০৭) '। এ ধরনের অজস্র ঘটনার উদাহরণ হাজির করা যায়। এগুলোর পেছনে সামাজিক ও মনস্তাত্বিক কারণকে অস্বীকার না করেও বলা যায় - এ ধরনের চাহিদা বা অভিপ্রায় প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। আর সে জন্যই, প্রখ্যাত রূপান্তরকামী বিশেষজ্ঞ হেনরী বেঞ্জামিন বলেন, আপাত পুরুষের মধ্যে নারীর সুপ্ত সত্তা বিরাজমান থাকতে পারে। আবার আপাত নারীর মধ্যে পুরুষের অনেক বৈশিষ্ট্য সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। তিনি বলেন - "Every Adam contains the element of Eve and every Eve harbors traces of Adam, physically as well as psychologically." হেনরী বেঞ্জামিন ছাড়াও এ নিয়ে গবেষণা করেছেন রবার্ট

[2] আজকাল, ১২ ই আগস্ট, ১৯৯৯।

স্টোলার, এথেল পারসন, লিওনেল ওভেসে প্রমুখ। এদের গবেষণায় উঠে এসেছে দুই ধরনের রূপান্তররকামীতার কথা। শৈশবের প্রথমাবস্থা থেকে যাদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের মানুষ হবার সুতীব্র বাসনা থাকে তাদের মুখ্য রূপান্তরকামী বলা হয়। অন্যদিকে যারা দীর্ঘদিন সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়েও নানারকম সমস্যায় পড়ে মাঝে মধ্যে নারীসুলভ ভাব অনুকরণ করার চেষ্টা করে তাদের বলে গৌন রূপান্তরকামী। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালান। তার এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতি ৩৭,০০০ এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে অন্যদিকে প্রতি ১০৩,০০০- এ একজন স্ত্রী রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এ সমীক্ষাটি চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে প্রতি ৩৪,০০০ এ একজন পুরুষ রূপান্তরকামী ভূমিষ্ট হচ্ছে আর অন্যদিকে প্রতি ১০৮,০০০ এ একজন জন্ম নিচ্ছে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামী। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে সেখানে ২৪,০০০ পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মধ্যে একজন রূপান্তরকামীর জন্ম হয়[3]। ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যায়, জোয়ান অব আর্ক থেকে শুরু করে আজকের প্রথিতযশা জীববিজ্ঞানী জোয়ান (জনাথন) রাফগার্ডেন কিংবা বাস্কেটবল লিজেন্ড ডেনিস রডম্যান সহ অনেকের মধ্যেই যুগে যুগে রূপান্তর প্রবণতা বিদ্যমান ছিল এবং এখনো আছে[4]। উইকিপেডিয়াতেও খ্যাতিমান রূপান্তরকামীদের একটি আংশিক তালিকা পাওয়া যাবে[5]।

এখন কথা হচ্ছে মানবসমাজে রূপান্তরকামীতার আস্তিত্ব আছে কেন? এ বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের 'সেক্স' এবং 'জেন্ডার' শব্দদুটির অর্থ এবং ব্যাঞ্জনা আলাদা করে বুঝতে হবে। সেক্স এবং জেন্ডার কিন্তু সমার্থক নয়। বাংলা ভাষায় শব্দদুটির আলাদা কোন অর্থ নেই, এদের সঠিক প্রতিশব্দও আমাদের ভাষায় অনুপস্থিত। সেক্স একটি শরীরবৃত্তিয় ধারণা। আর জেন্ডার মুলতঃ সমাজ- মনস্তাত্বিক অবস্থা। এই প্রসঙ্গে 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব সাইকোলজিতে' বলা হয়েছে -

> Sex refers to the physiological, hormonal and genetic makeup (XX or XY chromosome) of an individual; Gender is a cultural category that contains roles, behaviors, rights, responsibilities, privileges and personality traits assigned by that specific culture to men and women.

হেনরি বেঞ্জামিন তার 'ট্রান্সেক্সুয়াল ফেনোমেনন' বইয়ে অনেকবারই বলেছেন -

---

[3] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, সমপ্রেম, পূর্বোক্ত।
[4] Leslie Feinberg, Transgender Warriors : Making History from Joan of Arc to Dennis Rodman, Beacon Press, 1997.
[5] List of transgender people, wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_transgender_people

Gender is located above, and sex is below the belt.

অর্থাৎ সোজা কথায়, সেক্স সমগ্র বিষয়টিকে 'দেহ কাঠামো' নামক ছোট্ট চৌহদ্দির মধ্যে আটকে ফেলতে চায়, যেখানে জেন্ডার বিষয়টিকে নিয়ে যেতে চায় সাংস্কৃতিক নীলিমায়। আমরা আধুনিক চিন্তাধারার সাথে তাল মিলিয়ে এই বইয়ে 'সেক্স' বলতে শারীরিক লিঙ্গ বুঝব, আর 'জেন্ডার' বলতে বুঝব মানসিক কিংবা সাংস্কৃতিক লিঙ্গকে[6]।

মারিয়ার কথা

১৯৮৮ সালের অলিম্পকের আয়োজনে যোগদানের প্রস্তুতি চলছে। মারিয়া প্যাতিনো নামের স্পেনের শীর্ষস্থানীয় মহিলা হার্ডলার অলিম্পিকে যোগদানের শেষ প্রস্তুতিটুকু সেরে নিচ্ছেন। মেয়েদের ইভেন্টগুলোতে যোগদানের নিয়ম হিসেবে তাকে একটি ছোট্ট পরীক্ষা সেরে ফেলতে হবে। সেই পরীক্ষায় দেখা হবে মারিয়া সত্য সত্যই মেয়ে কিনা।

সেটা নিয়ে অবশ্য মারিয়ার চিন্তা নেই। তিনি যে মেয়ে তা জন্মের পর থেকেই তিনি জানেন। যে কেউ তাকে দেখলেই মেয়ে বলেই মনে করবে। দেহকাঠামো, কাঁধের আকার, কটিদেশ, নিতম্ব সব কিছুই বলে দেয় তিনি নারী। আগে নারী ক্রীড়াবিদদের গায়নোকলজিস্টদের প্যানেলের সামনে দিয়ে নগ্ন হয়ে হেটে যেতে হত। এখন পরিস্থিতি বদলেছে। এই অপমানজনক ব্যাপার স্যাপারের মধ্য দিয়ে তাদের যেতে হয় না। গালের পাশ থেকে সামান্য চামড়া নিয়ে জেনেটিক টেস্ট করে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফলাফল জানিয়ে দেয়া যায়।

[6] বইয়ের পরিশিষ্টে সেক্স এবং জেন্ডারের পার্থক্যসুচক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মারিয়া নির্বিঘ্ন চিত্তেই স্যাম্পল দিয়ে এলেন। কিন্তু ঘন্টাখানেক পরেই ডাক্তারের অফিস থেকে ফোন এল। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে। মারিয়াকে আবারো পরীক্ষা দিতে হবে। মারিয়া আবারো গেলেন। আবারো টেস্ট হল। এবারে আরেকটু বিস্তৃত পরীক্ষা। ডাক্তারদের মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই ঝামেলাটি কি ছিলো।

মারিয়া যখন পরদিন অলিম্পিকের ট্র্যাকে প্রথমবার দৌড়ানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, ঠিক তখনই খবরটি ফাঁস করা হল। মারিয়া 'সেক্স টেস্ট'- এ ফেল করেছেন। তিনি মেয়ের মত দেখতে হলেও ক্রোমোজমের গঠন অনুযায়ী তিনি পুরুষ। তার দেহকোষে Y-ক্রোমজোমের অস্তিত্ব রয়েছে। তার দেহের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় পুরুষাঙ্গের উপস্থিতি আছে। উপরন্তু, তার কোন ডিম্বাশয় এবং জরায়ু নেই। ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির (IOC) 'সংজ্ঞা' অনুযায়ী তিনি নারী নন। কাজেই তাকে অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।

হতাশ মারিয়া স্পেনে ফিরে এলেন। স্পেনে আসার পর তার জীবনে আক্ষরিক অর্থেই কেয়ামত নেমে এলো। স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ মারিয়ার আগের সমস্ত টাইটেল এবং পদক কেড়ে নিলো আর পরবর্তী সকল প্রতিযোগিতায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো। তার বয়ফ্রেন্ড তাকে ছেড়ে চলে গেলো। তার স্কলারশিপ বাতিল করা হল; হঠাৎ করেই মারিয়া নিজেকে দেখতে পেলেন অন্ধকারের এক অথৈ সমুদ্রে। পরে মারিয়া সেই সময়কার দুর্বিষহ অবস্থার কথা বর্ণনা করে বলেছিলেন এভাবে - 'আমাকে মানচিত্র থেকে স্রেফ মুছে ফেলা হল - এমন একটা ভাব যেন আমি কখনো ছিলামই না। অথচ আমি বারো বছর ধরে খেলাধূলার সাথে জড়িত ছিলাম, আর এই ছিলো তার প্রতিদান'[7]।

এর পরের ঘটনা আরো নাটকীয়। মারিয়া তার গাঁটের হাজার হাজার টাকা

[7] Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality, Anne Fausto-Sterling, Basic Books , November, 2000

[8] Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

[9] "Sex is much more a matter of hormones than of chromosomes. Indeed, the small Y chromosome, the root of all maleness, seems to do little besides turn on the "master male switch" to start the flow of hormones" see for details, Eve's Rib: Searching for the Biological Roots of Sex Differences, Robert Peel, Publishers, New York, 1994.

[10] বর্তমানে International Association of Athletics Federations নামে পরিচিত।

খরচ করে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হলেন। বহু ডাক্তারের সাথে তার মোলাকাৎ হল। ডাক্তারেরা অবশেষে তার এই অদ্ভুতুরে 'রোগের' কারণ খুঁজে পেলেন। তাকে জানানো হল, মেডিকেলের পরিভাষায় এই অবস্থাটিকে বলা হয় - Androgen Insensitivity । যদিও মারিয়া অন্য সব স্বাভাবিক ছেলেদের মত Y-ক্রোমজোম নিয়েই জন্মেছিলেন, এবং অন্য সব পুরুষের মত তার অন্ডকোষ থেকেও প্রচুর পরিমান পুরুষ হরমোন টেস্টোসটেরোন (এন্ড্রোজেন হরমোনের একটি স্টেরয়েড শ্রেনী) নিঃসৃত হয়েছিল, কিন্তু তার কোষগুলো শিশু বয়সে সেই নিঃসৃত হরমোনকে সনাক্ত করতে পারেনি। বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীতে বিশ হাজার পুরুষ শিশুর মধ্যে অন্ততঃ একজন এরকম 'এন্ড্রোজেন গ্রাহক' (androgen receptors)- জনিত সমস্যা নিয়ে পৃথিবীতে জন্মায়[8], যাদের কোষ এই নিঃসৃত এন্ড্রোজেন সনাক্ত করতে পারে না। মারিয়ারও তাই হয়েছিলো। এর ফলে মারিয়ার দেহে 'পুরুষসুলভ' বৈশিষ্টগুলো অনুপস্থিত ছিলো প্রথম থেকেই, যদিও তার ক্রোমোজমের গঠন ছিলো পুরুষেরই। তারপর বয়ঃসন্ধিকালে এন্ড্রোজেন নিঃসৃত হলেও তার দেহে এন্ড্রোজেনের প্রতি কোন সংবেদনশীলতা না থাকায় তার স্তন বৃদ্ধি পেল, কটিদেশ কমে আসলো, আর নিতম্ব ভারী হয়ে উঠলো, চারপাশের অন্যান্য নারীদের মতই। কাজেই মারিয়া দেখতে শুনতে এবং মন মানসিকতায়ও নারীই হয়ে উঠেছিলেন, তার ক্রোমজমে যাই থাকুক না কেন। নারীত্বের দাবী নিয়ে তার নিজের মনেও কখনোই সন্দেহের সৃষ্টি হয়নি।

মারিয়া আইওসি'র সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, তিনি জানেন তিনি নারী, তিনি বড়ও হয়েছেন নিজেকে নারী হিসবেই দেখে। হঠাৎ করে কেউ এসে বললো -তিনি পুরুষ, আর হলো নাকি! তিনি স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞানী এলিসন কার্লসনের সাথে মিলে তার নিজস্ব যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকলেন। বিজ্ঞানীরা আজ জানেন নারী কিংবা পুরুষ হবার ব্যাপারটা শুধু ক্রোমোজমের গঠনের উপরই নির্ভরশীল নয়, তার চেয়ে বেশী নির্ভর করে হরমোনের উপর [9]। অথচ অলিম্পিক কমিটির পরীক্ষায় হরমোন সংক্রান্ত ব্যাপার স্যাপারই নেই। মারিয়া দাবী করলেন, তার পেলভিক কাঠামো এবং কাঁধের কাঠামোর গঠন এবং অন্যান্য দেহজ বৈশিষ্টগুলো দেখে যেন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নারীদের ইভেন্টগুলোতে প্রতিযোগিতা করা জন্য তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে 'নারীত্ব' আছে কিনা! প্রায় আড়াই বছর ধরে যুদ্ধ চালানোর পর ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার এথলেটিক ফেডারেশন [10] (IAAF) মারিয়াকে

পূর্বেকার পদে পুনর্বহাল করলো এবং ১৯৯২ সালে মারিয়া আবার স্প্যানিশ অলিম্পিক দলে যোগদান করতে পারলেন। ইতিহাসে এই প্রথম বারের মত কোন নারী আইওসির 'সেক্স টেস্ট' সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে নিজের পরিচিতি নিয়েই অলিম্পিক দলে যোগদানের যোগ্যতা অর্জন করলেন। তবে আইএএফ মারিয়ার ব্যাপারে উদারতা দেখালেও আইওসি এখনও সেই সনাতন Y ক্রোমোজম দেখে সেক্স টেস্ট- এর রীতিতে বিশ্বাসী।

মারিয়ার মত ঘটনাগুলো আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে তৈরী করেছে যেমন অস্বস্তিকর পরিস্থিতির, তেমনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'সেক্স' নিয়ে আমাদের সনাতন ধ্যান ধারণাগুলোকে। এ ধরণের বহু ঘাত- প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমরা অবশেষে বুঝতে ছিখেছি যে, শুধু বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে এমনকি ক্রোমজোমের গঠন দিয়ে নারী- পুরুষকে সংজ্ঞায়িত করার দিন আর নেই। মানুষের লৈঙ্গিক পরিচিতি তুলে ধরতে হলে বাহ্যিক প্রকৃতির পাশাপাশি গণ্য করতে হবে মানুষের সমাজ- মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাকেও। আর এ জন্যই সেক্স জিনিসটার পাশাপাশি জেন্ডারের ধারণা থাকা, এবং জেন্ডার- সচেতনতা থাকা এই একবিংশ শতাব্দীতে খুবই প্রয়োজনীয়।

যৌনতার শরীরবৃত্তিয় বিভাজন মেনে নিয়েও বলা যায়, সামাজিক অবস্থার (চাপের) মধ্য দিয়েই আসলে এখানে একজন নারী 'নারী' হয়ে উঠে, আর পুরুষ হয়ে ওঠে 'পুরুষ'। আমাদের রক্ষণশীল সমাজ নারী আর পুরুষের জন্য জন্মের পর থেকেই দুই ধরনের দাওয়াই বাৎলে দেয়। নানা রকম বিধি- নিষেধ ও অনুশাসন আরোপ করে। পোশাক আষাক থেকে শুরু করে কথা বলার স্টাইল পর্যন্ত সবকিছুই এখানে লৈঙ্গিক বৈষম্যে নির্ধারিত হয়। এর বাইরে পা ফেলা মানেই যেন নিজ লিঙ্গের অমর্যাদা। কোন ছেলে একটু নরমভাবে কথা বললেই তাকে খোঁটা দেওয়া হয় 'মেয়েলী' বলে, আর নারীর উপর হাজারো রকম বিধি- নিষেধ আর নিয়মের পাহাড় তো আছেই। ফলে দুই লিঙ্গকে আশ্রয় করে তৈরি হয় দু'টি ভিন্ন বলয়। কিন্তু সমস্যা হয় রূপান্তরকামী মানুষদের নিয়ে। এরা আরোপিত বলয়কে অতিক্রম করতে চায়। তারা কেবল 'যৌনাঙ্গের গঠন অনুযায়ী' লিঙ্গ নির্ধারনের সনাতনী প্রচলিত ধারনাকে মন থেকে মেনে নিতে পারে না। তারা শারীরিক

লিঙ্গকে অস্বীকার করে বিপরীত সাংস্কৃতিক বা মানসিক লিঙ্গের সদস্য হতে চায়। তারা মনে করে দেহ নামক বাহ্যিক কাঠামোটি তাদের জন্য সঠিক লৈঙ্গিক পরিচয় তুলে ধরছে না; মনে করে সেক্স নয়, আসলে জেন্ডার অনুযায়ী তাদের লিঙ্গ নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর পর থেকে (বস্তুতঃ বিগত কয়েক দশকে) পশ্চিমা বিশ্বে জেন্ডার সম্পর্কিত ধারণা যত ঋদ্ধ হয়েছে ততই লৈঙ্গিক বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙে পড়ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে সেক্সচেঞ্জ অস্ত্রোপ্রচারে এসেছে বিপ্লব[11]। কানাডা, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়াম, ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে রূপান্তরকামী মানুষের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে সেক্সচেঞ্জ অপারেশনকে আইনসিদ্ধ করা হয়েছে। আমাদের মত সংখ্যাগরিষ্টদের জন্য ব্যাপারটা 'অস্বাভাবিক' কিংবা 'প্রকৃতিবিরুদ্ধ' শোনালেও খোদ প্রকৃতিতেই বহু প্রজাতির মধ্যে সেক্স চেঞ্জ বা রূপান্তরপ্রবণতা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এমনি কিছু উদাহরণ পাঠকদের জন্য হাজির করিঃ

উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে এক ধরনের ক্ষুদ্র প্রাণী খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। এরা আটলান্টিক স্লিপার শেল (Atlantic Slipper Shell) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানের পরিভাষায় এদের নাম ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (Crepidula Fornicata)। এই প্রজাতির পুরুষেরা একা একা ঘুরে বেড়ায়। তারপর তারা কোন স্ত্রী সদস্যদের সংস্পর্শে এলে সংগমে লিপ্ত হয়। যৌন সংসর্গের ঠিক পর পরই পুরুষদের পুরুষাংগ খসে পড়ে এবং এরা রাতারাতি স্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তরের পর এরা আর একাকী ঘুরে বেড়ায় না, বরং স্থায়ী হয়ে বসবাস করতে শুরু করে। প্রকৃতিতে পুরুষ থেকে নারীতে পরিনত হবার এ এক বিচিত্র দৃষ্টান্ত। ক্রিপিডুলা নিয়ে গবেষণায় বেড়িয়ে এসেছে আরো নানা ধরনের বিচিত্র তথ্য। বিজ্ঞানীরা এই প্রজাতির একটি সদস্যকে খুব ছোট অবস্থায় অন্য সদস্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। এবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায়, এর মধ্যে স্ত্রী জননাঙ্গের বিকাশ ঘটতে শুরু করেছে। কিন্তু যদি একে কোন পরিণত ক্রিপিডুলার সাথে রাখা হয়, তবে সে ধীরে ধীরে পুরুষে রূপান্তরিত হরে থাকে।

উত্তর আমেরিকার ওই একই অঞ্চলের 'ক্লিনার ফিশ' নামে পরিচিত এক ধরনের মাছের মধ্যে গবেষণা চালিয়ে বিজ্ঞানীরা রূপান্তরকামীতার পরিস্কার প্রমাণ পেয়েছেন। এ মাছগুলোর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus)। এ প্রজাতির পুরুষেরা সাধারণতঃ পাঁচ থেকে দশজন স্ত্রী নিয়ে ঘর বাঁধে (নাকি 'হারেম বাঁধে' বলা উচিৎ?)। কোন কারণে পুরুষ মাছটি মারা পড়লে স্ত্রীদের মধ্যে যে কোন একজন

[11] কারো চাহিদা বা অভিপ্রায়লে মূল্য দিয়ে সেক্স চেঞ্জ অপারেশন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পেলেও পরিণত বয়সে পৌছুনোর পূর্বেই অভিভাবকদের বা ডাক্তারদের ইচ্ছাকে মুল্য দিতে গিয়ে সেক্সচেঞ্জ করে উভলিঙ্গত্ব থেকে শিশুকে 'মুক্তি দেয়ার' চেষ্টা আজকে বিতর্কিত এবং মুল্যবোধের কষ্ঠিপাথরে প্রশ্নবিদ্ধ। এ নিয়ে পরবতীতে বিষদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

(সম্ভবতঃ সবচেয়ে বলশালী জন) সংসার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এই দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকেই ওই স্ত্রীমাছটির মধ্যে দৈহিক পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। দু সপ্তাহের মধ্যে সে পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে যায় (তার গর্ভাশয় ডিম্বানু উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, এবং নতুন করে পুরুষাংগ গজাতে শুরু করে) এবং এবং অন্যান্য স্ত্রী মাছদের সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মে স্ত্রী থেকে পুরুষে রূপান্তরের এও একটি মজার দৃষ্টান্ত। রূপান্তরকামীতার উদাহরণ আছে এনিমোন (anemone) বা 'ক্লাউন মাছ'দের (Clown Fish) মধ্যেও। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সামুদ্রিক প্রবাল প্রাচীরের কাছাকাছি বেড়ে ওঠা মাছদের মধ্যে পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী যৌনতার পরিবর্তন অতি স্বাভাবিক ঘটনা[12]।

চিত্রঃ এনিমোন বা ক্লাউন মাছদের মধ্যে সেক্স চেঞ্জ অতি সাধারণ একটি ঘটনা। প্রাকৃতিক ট্রান্সেক্সুয়ালিটির বাস্তব উদাহরণ।

ইউরোপিয়ান ফ্লে অয়েস্টার (European Flay Oyster) ও অস্ট্রা এডুলিস (Ostrea edulis) প্রজাতির ঝিনুকেরা যৌনক্রিয়ার সময় পর্যায়ক্রমে স্ত্রী ও পুরুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। বস্তুতঃ এদের একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষ জনন অংগের অবস্থান লক্ষ্য করা গেছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে জানা গেছে, এই প্রজাতির ঝিনুকেরা পুরুষ হিসেবে যৌনজীবন শুরু করার পর ধীরে ধীরে স্ত্রীর ভূমিকায় রূপান্তরিত হয়। ইংল্যান্ডের সমুদ্র উপকূলে এই ধরনের ঝিনুক প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় যেগুলো প্রতিবছর একবার করে তাদের যৌনতার পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরীয় উষ্ণ অঞ্চলে ওই একই ঝিনুকের দল প্রতি ঋতুতেই তদের যৌন রূপের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। নারী

[12] *Sex change? Something Fishy*, Release from Philadelphia Inquirer.

থেকে পুরুষ কিংবা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরের আকছার প্রমাণ পাওয়া গেছে ইউনো মার্জিনালিস (Uno marginalis) নামের আরো একটি প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যেও। সামুদ্রিক পোকা বলিনিয়ার মধ্যেও এ ধরণের রূপান্তর ঘটে থাকে। যৌনতার পরিবর্তন হরহামেশাই ঘটে চলেছে কিছু মাছি, কেঁচো, মাকড়শা এবং জলজ ফ্লি ডাফনিয়াদের মধ্যেও, এমনকি এদের অনেকেই পরিবেশ ও পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে 'যৌনপ্রজ' থেকে 'অযৌনপ্রজ'তেও রূপান্তরিত হয়[13] ।

তাহলে এখন প্রশ্ন হল, এই সমস্ত উদাহরণ এখানে দেওয়ার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হল, প্রকৃতির বৈচিত্রময় জীবজগতের সাথে পরিচিত হওয়া। সেই সাথে এটাও বুঝা যে ব্যাপারগুলো এত সোজাসাপ্টা নয়, যে আমরা হলফ করে বলে দিতে পারব শুধু আমরা যৌনপ্রজরাই প্রাকৃতিক, আর বাকীরা সব 'বানের জলে ভেসে এসছে' । এরকম ভাবার আগে আমাদের বোঝা উচিৎ যে, সাদা- কালো এরকম চরম সীমার মাঝে সবসময়ই কিছু ধুসর এলাকা থাকে। আর সেই ধুসর এলাকায় নির্বিঘ্নে বাস করে সমকামিতা, উভকামিতা, উভকামের সমকামিতা, রূপান্তরকামিতার মত যৌনপ্রবৃত্তিগুলো।

উভকামিতার জগৎ

মনোবিজ্ঞানী সিগমুন্ড ফ্রয়েড অনেক আগেই যৌনপ্রবৃত্তি হিসেবে উভকামিতার অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেছিলেন[14] -

> " পৃথিবীর সব মানুষই আসলে উভকামী. . . এবং তাদের লিবিডো থাকে দুই লিঙ্গের পরিসীমায় বিন্যস্ত . . . ।'

আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে যখন কিন্সের স্কেলের সাথে পরিচিত হব তখন দেখব যে, সমকামিতা এবং বিষমকামিতা - মানব জীবনের এই দুই যৌপ্রবৃত্তি থাকে স্কেলের দুই দিকের দুই প্রান্তসীমায়। মাঝামাঝি অংশটিতে থাকে উভকামিতার অনন্য ভূবণ। কোন ব্যক্তি যখন একই সাথে সমলিঙ্গ ও বিষমলিঙ্গের প্রতি যুগপৎ যৌনাকর্ষণ অনুভব করেন, তখন তাকে উভকামী (Bisexual) বলা হয়। উভকামী ব্যক্তির যৌনজীবন খন্ডিত ভাবে

---

[13] David Crews, Animal Sexuality, Scientific American, January, 1994

[14] ফ্রয়েডের সম্পূর্ণ উক্তিটি ছিলো এরকম -

'We have come to learn, that **every human being is bisexual** in this sense, and that his libido is distributed, either in a manifest or a latent fashion, over objects of both sexes'
(Ref. Steven Angelides , A History of Bisexuality, University Of Chicago Press; 1 edition (September 15, 2001)

দেখা হলে কখনো তাকে বিষমকামী কখনো বা সমকামী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আধুনিক গবেষকেরা উভকামিতাকে আলাদা একটি যৌনপ্রবৃত্তি হিসবে গন্য করারই পক্ষপাতি। এটা নিশ্চিত যে, ব্যক্তির যৌনজীবনের সামগ্রিকরূপটি যদি উন্মোচিত হয়, তবে তাকে উভকামিতার পর্যায়ে ফেলাই হবে সংগত। কিন্তু মুশকিল হল, উভকামিতাকে স্বীকৃতি দিতে গেলে নারী- পুরুষের 'স্বাভাবিক' প্রথাসিদ্ধ জীবন অনেক সময়ই ভেঙ্গে পড়ে। কারণ, উভকামিতা নামক প্রবৃত্তিটি বিষমকামী সম্পর্কের সনাতন 'মনোগামিতার মিথ'টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলে খুব স্বাভাবিকভাবেই। অস্কার ওয়াইল্ডের উদাহরনটি এখানে উল্লেখ্য। প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড ছিলেন উভকামী। তিনি বিবাহিত জীবন যাপনের পরেও একজন পুরুষের সাথে মনোদৈহিক সম্পর্কে জড়িয়ে পরেছিলেন। ওয়াইল্ডের এই প্রবৃত্তিকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে মেনে নিতে গেলে তার স্ত্রীর বাইরে ওই পুরুষটির সম্পর্কটিকেও মেনে নিতে হয়। ফলে 'বিবাহ' নামক প্রতিষ্ঠানটির ভিত দুর্বল হয়ে যায়। তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজ একে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারেনি। অস্কার ওয়াইল্ডকে সেজন্য পোহাতে হয় কারাদন্ড। শুধু ওয়াইল্ড কেন কিছুদিন আগে জেমস ম্যাকগ্রিভি তাঁর নিভৃত সমকামের কথা স্বীকার করে নিউজার্সির গভর্নর পদ থেকে পদত্যাগ করেন ২০০৪ সাল । তিনি বিবাহিত ছিলেন, ছিলেন দুই কন্যার পিতা। তার সমকামী প্রবণতার কথা প্রকাশিত হবার আগ পর্যন্ত সবাই তাকে বিষমকামীই ভেবেছিলেন। তার সমকামিতার ঘটনা প্রকাশিত হবার পর স্ত্রীর সাথে তার বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে। শুধু তাই নয়, তার স্ত্রী এও বলেন, 'ম্যাকগ্রিভি সমকামী জানলে তাকে আমি কখনোই আমার সন্তানের পিতা হতে দিতাম না'। আসলে উভকামীরা অনেক সময়ই শুধু প্রথাগত সমাজ নয়, সমকামী এবং বিষমকামী - দু দল থেকেই বঞ্চনার স্বীকার হয়। বিষমকামী তো বটেই এমনকি সমকামী মানুষদেরও এমন ধারণাই বদ্ধমূল যে, বিষমকামিতার বাইরে 'সমান্তরাল যৌনপ্রবৃত্তি' বলতে কেবল সমকামিতাকেই বোঝায়। সমকামীরা উভকামীদের সমস্যাকে বুঝতে চায় না। তাদের অনেকের কথা হল - উভকামী বলে কিছু নেই; আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের বিখ্যাত উক্তির মত উক্তি উভকামীদের প্রতিনিয়ত হজম করতে হয় - 'স্টে আইদার উইথ আস অর উইথ দেম'[15]। আর কোন তৃতীয় সত্তাকে কোন দলই গ্রহণ করতে চায় না। ব্যাঙ্গালোরের 'পিপলস ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টি'র ক্ষেত্র- সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে সমকামীরা উভকামীদের শুধু প্রত্যাখ্যানই করে না, ঘৃণাও করে[16]। ফলে প্রান্তিকায়িত যৌন প্রবৃত্তির সদস্যদের মধ্যেও উভকামীরা দ্বিতীয়বার প্রান্তিক হিসেবে চিহ্নিত হয়। তারা হয়ে ওঠে সত্যিকার সংখ্যালঘু। এদের জীবন- যন্ত্রণা হয় আরো মর্মান্তিক, এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভয়াবহ।

---

[15] ' You are either with us or against us' , Bush's speech in 20001 for Combating terrorism; http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/gen.attack.on.terror/

[16] অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু, *সমপ্রেম*, পূর্বোক্ত।